#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

09th to 14th Mar 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** **01**
   - 1.1. ভূগোল 01
     - 1.1.1. ভূমিকম্প 01

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **07**
   - 2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 07
     - 2.1.1. এক দেশ এক নির্বাচন 07
   - 2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 10
     - 2.2.1. ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতি 10

3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **15**
   - 3.1. অর্থনীতি 15
     - 3.1.1. ভারতের আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 15
     - 3.1.2. ভারতের জন্য টেকসই জ্বালানি 18
   - 3.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 22
     - 3.2.1. সার্বভৌম এআই: ডিজিটাল যুগে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন 22

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

RICEIAS.COM +91 8100819447 Follow us on:

Sealdah, Kolkata **Old Rajinder Nagar, New Delhi** **At Adamas University**

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ভূগোল

1.1.1. ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের সম্পর্কে

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের একটি আকস্মিক কম্পন, যা ভূ-ত্বকের ভেতরে **শক্তির মুক্তির** কারণে ঘটে এবং এর ফলে **সিসমিক তরঙ্গ** (seismic waves) সৃষ্টি হয়। এটি সাধারণত **ফল্ট লাইন** (fault lines) বা টেকটোনিক প্লেটের সীমানা বরাবর ঘটে থাকে।

- এটি **রিখটার স্কেল** (Richter Scale) (মাত্রা বা ম্যাগনিটিউড) এবং **মডিফাইড মারকালি ইনটেনসিটি** (MMI) স্কেল (তীব্রতা) দিয়ে পরিমাপ করা হয়।
- বেশিরভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগরীয় **রিম অফ ফায়ার** (Ring of Fire)-এর মতো প্লেট সীমানা বরাবর ঘটে।
- **ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চলের** কাছাকাছি অবস্থানের কারণে ভারত ভূমিকম্পের প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

ভূমিকম্পের কারণ

১. **প্রাকৃতিক কারণ**

পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার বা শিলামণ্ডল কয়েকটি **টেকটোনিক প্লেটে** বিভক্ত, যা ম্যান্টলের পরিচলন স্রোতের কারণে অনবরত নড়াচড়া করছে।

- **টেকটোনিক চলন**
  - **অভিসারী সীমানা** (Convergent Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় (যেমন: ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে), যা **হিমালয়** পর্বত তৈরি করেছে এবং উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে।
  - **প্রতিসারী সীমানা** (Divergent Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় (যেমন: মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা), যা ম্যাগমাকে উপরে উঠতে দেয় এবং কম্পন সৃষ্টি করে।
  - **রূপান্তর সীমানা** (Transform Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের পাশ দিয়ে অনুভূমিকভাবে সরে যায় (যেমন: সান আন্দ্রেয়াস ফল্ট), ফলে ঘর্ষণ তৈরি হয় এবং হঠাৎ শক্তি মুক্তির মাধ্যমে ভূমিকম্প ঘটে।
- **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত:** ম্যাগমার প্রচণ্ড নড়াচড়া বা গ্যাসের বিস্ফোরণ স্থানীয় কিন্তু তীব্র সিসমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারে।
- **ফল্টিং এবং ফোল্ডিং (চ্যুতি ও ভাঁজ):** প্রচণ্ড চাপের মুখে শিলা একসময় ফেটে যায় (**চ্যুতি**) বা বেঁকে যায় (**ভাঁজ**)। যখন এটি সহ্যক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন **'ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিওরি'** অনুযায়ী হঠাৎ ফেটে গিয়ে সিসমিক শক্তি মুক্ত হয়।

২. **মনুষ্যসৃষ্ট কারণ**

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ ভূ-ত্বকের চাপের ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে:

- **জলাধার-প্ররোচিত ভূমিকম্প** (Reservoir-Induced Seismicity - RIS): বিশাল জলাধারের পানির ওজন (যেমন: মহারাষ্ট্রের **কয়না বাঁধ**) নিচের শিলাস্তরে চাপ সৃষ্টি করে এবং বিদ্যমান ফাটলগুলোকে পিচ্ছিল করে দেয়।
- **খনি খনন এবং পাথর উত্তোলন:** মাটির গভীরে খনি খননের ফলে 'রক বার্স্ট' বা খনির ছাদ ধসে পড়ে কম্পন সৃষ্টি হতে পারে।

- **পারমাণবিক বিস্ফোরণ:** ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, যা প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে।

ভূমিকম্পের প্রকারভেদ

(১) উৎপত্তির ভিত্তিতে

- **টেকটোনিক ভূমিকম্প:** প্লেট চলাচলের কারণে ঘটে (সবচেয়ে সাধারণ)।
- **আগ্নেয়গিরিজনিত ভূমিকম্প:** অগ্ন্যুৎপাতের সাথে সম্পর্কিত।
- **ধসজনিত (Collapse) ভূমিকম্প:** ভূগর্ভস্থ খনি ধসে পড়ার কারণে হয়।
- **বিস্ফোরণজনিত ভূমিকম্প:** পারমাণবিক বা রাসায়নিক বিস্ফোরণের কারণে ঘটে।

(২) গভীরতার ভিত্তিতে

প্রকার	গভীরতা	বৈশিষ্ট্য
অগভীর উৎস (Shallow Focus)	০ – ৭০ কিমি	**সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক।** শক্তিকে খুব কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, তাই তীব্রতা অনেক বেশি থাকে।
মধ্যবর্তী উৎস (Intermediate Focus)	৭০ – ৩০০ কিমি	মাঝারি প্রভাব; সাধারণত সাবডাকশন জোনে ঘটে।
গভীর উৎস (Deep Focus)	৩০০ – ৭০০ কিমি	একে **প্লুটোনিক** ভূমিকম্পও বলা হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে অনুভূত হলেও ভূপৃষ্ঠে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাব

১. ভৌত ও কাঠামোগত প্রভাব

- **ভবন ধসে পড়া:** এটি মৃত্যুর প্রধান কারণ।
  - *উদাহরণ:* **২০২৩ সালের তুরস্ক-সিরিয়া ভূমিকম্প**, যেখানে হাজার হাজার ভবন তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে ৫০,০০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।
- **অবকাঠামো ধ্বংস:** সেতু, বাঁধ এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি।
  - *উদাহরণ:* **১৯৯৩ সালের লাতুর ভূমিকম্প**, যা গ্রামীণ মহারাষ্ট্রের পাথুরে বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছিল।

২. ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত প্রভাব

- **ভূপৃষ্ঠে চ্যুতি:** পৃথিবীর উপরিভাগে দৃশ্যমান ফাটল বা স্থানচ্যুতি।
- **মাটির তরলীকরণ (Liquefaction):** নরম মাটি তরলের মতো আচরণ করে, যার ফলে বড় ভবনগুলো হেলে পড়ে।
  - *উদাহরণ:* **২০১১ সালের নিগাতা (জাপান) ভূমিকম্প**, যেখানে আস্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং অক্ষত অবস্থায় মাটিতে হেলে পড়েছিল।
- **ভূমিধস/তুষারধস:**
  - *উদাহরণ:* **২০১৫ সালের নেপাল ভূমিকম্প**, যা এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে বিশাল তুষারধস সৃষ্টি করেছিল এবং ল্যাংটাং গ্রামকে সমাহিত করেছিল।

৩. গৌণ বিপদ

- **সুনামি:** সমুদ্রের তলদেশের স্থানচ্যুতির কারণে সৃষ্ট বিশাল ঢেউ।

- *উদাহরণ:* **২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় সুনামি**, যা ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জসহ ১৪টি দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

- **আকস্মিক বন্যা:** ভূমিধসের ফলে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়, যা পরে ফেটে গিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে।
  - *উদাহরণ:* ভূমিকম্পের পর **সিকিম-হিমালয় অঞ্চলে** প্রায়ই এমন ঝুঁকি দেখা যায়।
- **শহুরে অগ্নিকাণ্ড:** গ্যাস লাইন ফেটে যাওয়া বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগা।
  - *উদাহরণ:* **১৯২৩ সালের গ্রেট কান্টো ভূমিকম্প (জাপান)**, যেখানে কম্পনের চেয়ে আগুনেই বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

৪. **আর্থ-সামাজিক প্রভাব**

- **অর্থনৈতিক ক্ষতি:** পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় কোষাগারের ওপর বিশাল চাপ।
  - *উদাহরণ:* **২০০১ সালের ভুজ ভূমিকম্পে** আনুমানিক **৫ বিলিয়ন ডলার** ক্ষতি হয়েছিল এবং স্থানীয় শিল্পখাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।
- **জনস্বাস্থ্য সংকট:** ত্রাণ শিবিরে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক আঘাত (PTSD)।
- **যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা:** সমুদ্রতলের ক্যাবল এবং স্যাটেলাইটের ওপর আধুনিক নির্ভরশীলতা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে তোলে।

ভারতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি

ভারত **ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংযোগস্থলে** (convergent boundary) অবস্থিত, যার ফলে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্পের দিক থেকে অত্যন্ত সক্রিয়।

- ভারতের মোট ভূখণ্ডের প্রায় **৫৯% এলাকা** বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।
- **বিপজ্জনক জনসংখ্যা:** ভারতের প্রায় **৭৫% মানুষ** ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসবাস করেন।
- **"সিসমিক গ্যাপ"** (Seismic Gap)**:** বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে **'মধ্য হিমালয় গ্যাপ'** নিয়ে চিন্তিত। হিমালয়ের এই অংশে গত ২০০ বছরে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি, তাই এখানে একটি **'মহা-ভূমিকম্প' (M > ৮.০)** হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিউরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) ঝুঁকির ভিত্তিতে ভারতকে **চারটি সিসমিক জোনে** (II–V) ভাগ করেছে:

- **জোন V (অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি):** হিমালয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ভারত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
- **জোন IV (উচ্চ ঝুঁকি):** দিল্লি, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড।
- **জোন III (মাঝারি ঝুঁকি):** মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশ।
- **জোন II (কম ঝুঁকি):** অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল উপদ্বীপীয় অঞ্চল।

ক্ষতি হ্রাসের কৌশল

১. **কাঠামোগত প্রশমন (ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান)**

- **সিসমিক রেট্রোফিটিং:** স্টিল ব্রেসিং, বেস আইসোলেশন বা জ্যাকেটেড কলাম ব্যবহারের মাধ্যমে পুরনো ও দুর্বল ভবনগুলোকে (বিশেষ করে হাসপাতাল ও স্কুল) শক্তিশালী করা।
- **বেস আইসোলেশন এবং ড্যাম্পার:** ভবনের ভিত্তিতে নমনীয় বিয়ারিং বা **"শক অ্যাবজর্বার"** ব্যবহার করা যাতে মাটির কম্পন ভবন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।
  - **উদাহরণ:** ২০০১ সালের ভূমিকম্পের পর **ভুজ জেলা হাসপাতাল** বেস আইসোলেশন প্রযুক্তি দিয়ে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

- **বিল্ডিং কোডের কঠোর প্রয়োগ:** নতুন সমস্ত নির্মাণ যাতে IS 1893: 2016 (সিসমিক ডিজাইন) এবং IS 13920 (ডাক্টাইল ডিটেইলিং) মেনে চলে তা নিশ্চিত করা।
- **হালকা ওজনের উপকরণের ব্যবহার:** উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় (জোন V) ফাঁপা ইট বা বাঁশ-ভিত্তিক শক্তিশালী কাঠামো ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

২. **অ-কাঠামোগত প্রশমন (নীতিগত সমাধান)**

- **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন (Seismic Microzonation):** মাটির ধরন অনুযায়ী একটি শহরকে ছোট ছোট 'মাইক্রো-জোনে' ভাগ করা যাতে বোঝা যায় কোন এলাকায় কম্পন বেশি হবে (যেমন: দিল্লি ও বেঙ্গালুরু এটি সম্পন্ন করেছে)।
- **ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা:** কঠোর জোনিং আইনের মাধ্যমে 'ফল্ট লাইন' বা মাটির তরলীকরণ প্রবণ (liquefaction-prone) নদীর তীরে বহুতল ভবন নির্মাণ নিষিদ্ধ করা।
- **আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা (EWS):** এমন সেন্সর বসানো যা **P-তরঙ্গ** (দ্রুত কিন্তু কম ক্ষতিকর) শনাক্ত করে **S-তরঙ্গ** (ধ্বংসাত্মক) আসার ১০-৬০ সেকেন্ড আগে সতর্কতা দিতে পারে।
  - **উদাহরণ:** উত্তরাখণ্ডের Earthquake Early Warning (EEW) অ্যাপ।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি: "আপদা মিত্র"** (স্বেচ্ছাসেবক) প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নিয়মিত **মেগা মক ড্রিল** (যেমন: বার্ষিক 'অনুশীলন সহায়তা') আয়োজন করা।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈশ্বিক কাঠামো**

- NDMA **নির্দেশিকা:** বহুতল ভবনের জন্য "নিরাপদ নির্মাণ পদ্ধতি" এবং "বাধ্যতামূলক প্রযুক্তিগত অডিট"-এর ওপর জোর দেওয়া।
- CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure): ভারতের নেতৃত্বে একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, যা বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মতো অবকাঠামোকে ভূমিকম্প সহনীয় করতে কাজ করে।
- **বিমা সুবিধা:** দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি আর্থিক চাপ কমাতে **"ক্যাটাস্ট্রফি ইন্স্যুরেন্স"** বা দুর্যোগ বিমাকে উৎসাহিত করা।

ভূমিকম্প মোকাবিলায় ভারতের প্রস্তুতি

১. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫:** ভারতের প্রস্তুতির মূল ভিত্তি, যা তিন স্তরের কাঠামো তৈরি করেছে: NDMA (জাতীয়), SDMA (রাজ্য) এবং DDMA (জেলা)।
- NDMA **নির্দেশিকা (২০২৬ আপডেট):** সর্বশেষ নির্দেশিকায় **"বিল্ড ব্যাক বেটার"** (আরও ভালো করে গড়ে তোলা) এবং সাধারণ ঝুঁকি মূল্যায়নের পরিবর্তে **প্রবাবিলিস্টিক সিসমিক হ্যাজার্ড অ্যাসেসমেন্ট (PSHA)** পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- NDRF **(জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদানকারী বাহিনী):** ১৬টি ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ বাহিনী যারা ধসে পড়া কাঠামোয় অনুসন্ধান ও উদ্ধারে (CSSR) প্রশিক্ষিত।

২. **প্রযুক্তিগত ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা**

- **জাতীয় সিসমোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক (NSN):** ২০২৬ সালের শুরুর দিকে এই নেটওয়ার্ক **১৬৯টি স্টেশনে** উন্নীত করা হয়েছে (যা ২০১৪ সালে ছিল ৮০টি)।
- **আগাম সতর্কতা (EEW) ব্যবস্থা:** উত্তরাখণ্ডে এটি বর্তমানে কার্যকর (ভারতে প্রথম)। হিমালয় অঞ্চল জুড়ে এটি সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

- **সচেত (Sachet) পোর্টাল (NDMA):** একটি সর্বভারতীয় সমন্বিত সতর্কতা ব্যবস্থা যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় রিয়েল-টাইম সতর্কবার্তা পাঠায়।

৩. **কাঠামোগত প্রস্তুতি**

- **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন:** দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং গুয়াহাটির মতো শহরগুলোতে এটি সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে মাটির গঠন অনুযায়ী ঝুঁকির এলাকা (যেমন: দিল্লির যমুনা প্লাবনভূমি) চিহ্নিত করা সম্ভব।
- **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) ২০১৬:** ভূমিকম্প-সহনশীল নকশার জন্য বাধ্যতামূলক মানদণ্ড।
- **রেট্রোফিটিং:** জোন IV এবং V-এ হাসপাতাল, স্কুল এবং সেতুর মতো **"লাইফলাইন স্ট্রাকচার"** শক্তিশালী করার সরকারি উদ্যোগ।

৪. **জনসমষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি**

- **আপদা মিত্র প্রকল্প:** ১ লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবকদের **"ফার্স্ট রেসপন্ডার"** হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- **স্কুল সুরক্ষা কর্মসূচি:** স্কুলগুলোতে দুর্যোগকালীন জরুরি পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে NIDM দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি।
- **ঐতিহ্যগত জ্ঞান:** হিমাচলের **'কাঠ-কুনি'** এবং কাশ্মীরের **'ধাজ্জি-দেওয়ারি'**-র মতো ভূমিকম্প-সহনশীল ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকলাকে আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতিতে যুক্ত করা।

ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত ও ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ**

- **আইন প্রয়োগে ঘাটতি:** দিল্লি বা গুয়াহাটির মতো শহরে প্রায় ৮০% ভবন IS 1893 নিয়ম লঙ্ঘন করে তৈরি; বিশেষজ্ঞের তদারকি ছাড়াই প্রচুর "নন-ইঞ্জিনিয়ারড" ভবন নির্মিত হচ্ছে।
- **রেট্রোফিটিং সমস্যা:** ভারতের প্রায় ১২ কোটি ভবন শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চ খরচ, কারিগরি জটিলতা এবং ভবন খালি করার সমস্যার কারণে এটি থমকে আছে।
- **দক্ষতার অভাব:** ভূমিকম্প-সহনশীল নির্মাণে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজমিস্ত্রির তীব্র অভাব।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত চ্যালেঞ্জ**

- **২০২৬-এর "সিসমিক রোলব্যাক":** শিল্প খাতের চাপে IS 1893: 2025 কোডটি (যা 'জোন VI' চালুর প্রস্তাব করেছিল) সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
  - **কারণ:** নির্মাণ খরচ ২০-৫০% বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলো লোকসানের মুখে পড়ার ভয়।
- **কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আজও অনেক বেশি কেন্দ্র-নির্ভর; জেলা পর্যায়ের সংস্থাগুলোর (DDMAs) নিজস্ব বাজেট বা বিশেষজ্ঞ কর্মীর অভাব রয়েছে।
- **যোগাযোগের ঘাটতি:** পর্যবেক্ষণ স্টেশন বাড়লেও সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে রিয়েল-টাইম সতর্কবার্তার জন্য **"লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি"** নেই।

৩. **ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ**

- **হিমালয়ের ভঙ্গুরতা: 'সেন্ট্রাল হিমালয়ান গ্যাপ'**-এ টেকটোনিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে একটি বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকলেও অপরিকল্পিত নগরায়ন থেমে নেই।
- **মাটির বিস্তৃতি ও তরলীকরণ:** উত্তর ভারতের নরম পলিমাটি কম্পনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরেও মাটির ধস (liquefaction) ঘটাতে পারে।

- **গ্রামীণ-শহুরে ব্যবধান:** গ্রামীণ এলাকায় কাঁচা বাড়িগুলো দ্রুত ধসে পড়ে, অন্যদিকে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে অগ্নিকাণ্ডের মতো গৌণ বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **ঝুঁকি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা:** ২০২৬ সালের 'সিসমিক রোলব্যাক' পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য IS 1893:2025 মানদণ্ডগুলো ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে। প্রথমেই মেট্রো, পারমাণবিক কেন্দ্র এবং হাসপাতালের মতো **"লাইফলাইন অবকাঠামো"**-র জন্য 'ভূমিকম্প সহনশীলতা শংসাপত্র' বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।
- **জাতীয় রেট্রোফিটিং মিশন:** দেশের ১২ কোটি বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে শক্তিশালী করতে একটি নিবেদিত মিশন চালু করা। এর আওতায় বাড়িওয়ালাদের **"রেজিলিয়েন্স লোন"** (সহনশীলতা ঋণ), কর ছাড় এবং **প্যারামেট্রিক ইন্স্যুরেন্স** প্রদান করতে হবে যাতে দুর্যোগের পরপরই দ্রুত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়।
- **প্রযুক্তিগত সংযোগ:** হিমালয় অঞ্চলের **আগাম সতর্কতা ব্যবস্থাকে (EEW)** আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে ভূমিকম্পের সময় গ্যাস গ্রিড এবং রেল নেটওয়ার্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে স্মার্ট সিটি মাস্টার প্ল্যানে **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন**-কে যুক্ত করা।
- **বিকেন্দ্রীভূত দক্ষতা বৃদ্ধি: 'আপদা মিত্র'** কর্মসূচিকে প্রতিটি জেলায় সম্প্রসারিত করা। স্থানীয় রাজমিস্ত্রিদের **'ডাক্টাইল ডিটেইলিং'** এবং হিমাচলের **'কাঠ-কুনি'**-র মতো ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ শৈলীতে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যয়িত (Certify) করে কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করা।
- **DRI-কে মূলধারায় আনা: কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI)**-কে কাজে লাগিয়ে **ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন (NIP)**-কে দুর্যোগ-সহনীয় করে তোলা। "দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ" দেওয়ার মানসিকতা বদলে **"পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ঝুঁকি-ভিত্তিক উন্নয়ন"**-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

উপসংহার

"দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ" দেওয়ার প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে **"ঝুঁকি-ভিত্তিক উন্নয়ন"**-এর পথে চলা এখন সময়ের দাবি। **সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক**-এর সাথে অত্যাধুনিক **আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা** এবং CDRI-এর নেতৃত্বকে যুক্ত করতে পারলে ভারতের **৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক স্বপ্ন** ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার মুখেও সুরক্ষিত থাকবে।

Q. The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. Discuss various aspects.

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. এক দেশ এক নির্বাচন

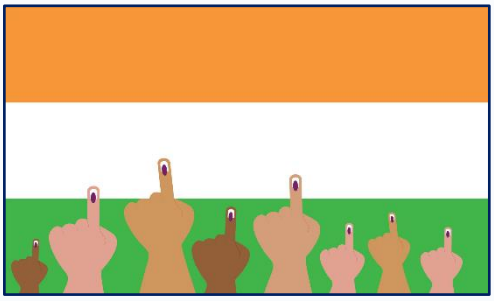

ভূমিকা

এক দেশ এক নির্বাচন ধারণাটি এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে **লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা** এবং **স্থানীয় সংস্থাগুলির** (পঞ্চায়েত ও পৌরসভা) নির্বাচন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একযোগে বা সমসাময়িকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- **স্বাভাবিক নিয়ম (১৯৫১-১৯৬৭):** স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক (১৯৫১-৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭) ভারতে একযোগে নির্বাচন হওয়াই ছিল সাধারণ দস্তুর।
- **বিঘ্ন ঘটা:** ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে বেশ কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা (যেমন- হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ) এবং ১৯৭০ সালে খোদ লোকসভা সময়ের আগে ভেঙে যাওয়ার ফলে এই চক্রটি ভেঙে যায়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন:**
  - **ল কমিশন (১৭০তম রিপোর্ট, ১৯৯৯):** স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পুনরায় একযোগে নির্বাচনের সুপারিশ করেছিল।
  - **নির্বাচন কমিশন (১৯৮৩):** নির্বাচনী চক্র ভেঙে যাওয়ার পর প্রথমবার এই ধারণাটি উত্থাপন করেছিল।
  - **নীতি আয়োগ (২০১৭):** দুই ধাপে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে একই সময়ের মধ্যে আনার পক্ষে একটি কার্যপত্র (Working paper) প্রকাশ করেছিল।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর গুরুত্ব

১. **শাসনব্যবস্থা এবং নীতির ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করা**

- **"নীতিগত পক্ষাঘাত" বা পলিসি প্যারালাইসিস দূর করা:** ঘনঘন **আদর্শ আচরণবিধি (MCC)** জারি হওয়ার ফলে নতুন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ থমকে যায়। 'এক দেশ এক নির্বাচন' নিরবচ্ছিন্ন শাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার নিশ্চিত করে।
- **কাজের ওপর গুরুত্ব:** এটি নেতৃত্বের মনোযোগ "সারাক্ষণ নির্বাচনী প্রচার" থেকে সরিয়ে প্রশাসনিক কাজের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জনমোহিনী রাজনীতির বদলে চার-পাঁচ বছর ধরে উন্নয়নের কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

২. **অর্থনৈতিক ও আর্থিক গুরুত্ব**

- **বিপুল খরচ সাশ্রয়:** এটি লজিস্টিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্বিগুণ খরচ কমিয়ে দেয়। একযোগে ভোট হলে ঘনঘন নির্বাচনের কারণে অপচয় হওয়া প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি অর্থ সাশ্রয় হবে।
- **জিডিপি (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়ক:** নির্বাচনী র‍্যালির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে (Supply-chain) বিঘ্ন ঘটা হ্রাস পায়। উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি (HLC) পরামর্শ দিয়েছে যে, এটি প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধিতে **১.৫ শতাংশ পয়েন্ট** পর্যন্ত অবদান রাখতে পারে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** বিকেন্দ্রীভূত এবং বিশাল নির্বাচনী ব্যয়ের ফলে বাজারে হঠাৎ যে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়, এটি তা নিয়ন্ত্রণ করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সাহায্য করে।

৩. **প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা দক্ষতা**

- **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) এবং সিভিল কর্মীদের (যেমন- শিক্ষক) বারবার তাদের মূল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নির্বাচনী কাজে লাগানো বন্ধ হবে। এতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সরকারি পরিষেবা আরও উন্নত হবে।
- **একক ভোটার তালিকা:** একটি সাধারণ ভোটার তালিকা এবং **একক ভোটার কার্ড** (Single EPIC)-এর মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজ হবে। এতে তথ্যের দ্বিরুক্তি বন্ধ হবে এবং নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রশাসনিক চাপ কমবে।

৪. **গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রভাব**

- **জনমোহিনী রাজনীতি রোধ:** এটি স্বল্পমেয়াদী "বিনামূল্যে উপহার" বা খয়রাতি দেওয়ার প্রবণতার বদলে অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং "কঠিন" সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেয়।
- **দুর্নীতি দমন:** ঘনঘন নির্বাচন না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সারাক্ষণ তহবিল সংগ্রহের চাপ কম থাকে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় **"কালো টাকা"**-র ভূমিকা কমিয়ে দিতে পারে।
- **ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি:** এটি **"ভোটার ক্লান্তি"** দূর করে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সুবিধা তৈরি করে, যারা একবার বাড়ি ফিরেই সরকারের বিভিন্ন স্তরের (কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয়) জন্য ভোট দিতে পারবেন।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সাংবিধানিক ও আইনি বাধা**

- **প্রধান সংশোধনী:** এর জন্য সংবিধানের **৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪ এবং ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** সংশোধন করা প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদগুলো লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোর মেয়াদ এবং তা ভেঙে দেওয়ার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে।
- **রাজ্যগুলোর অনুমোদন:** কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং স্থানীয় সরকার (৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনী) সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুচ্ছেদ ৩৬৮-এর অধীনে অন্তত **অর্ধেক রাজ্য বিধানসভার** সম্মতির প্রয়োজন।
- **মধ্যবর্তী সময়ে পতন:** যদি কোনো সরকার মেয়াদের মাঝপথে **ভেঙে যায়**, তবে একটি বড় সংকট তৈরি হবে। বর্তমান প্রস্তাবে "অবশিষ্টাংশ মেয়াদের" (শুধুমাত্র বাকি সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন) কথা বলা হয়েছে, যা ঘনঘন "অন্তর্বর্তী" নির্বাচনের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং ওনো (ONOE)-এর মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করতে পারে।

২. **ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি হুমকি**

- **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন খর্ব হওয়া:** রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের মেয়াদের সাথে তাল মেলাতে বাধ্য করা তাদের স্বাধীন সাংবিধানিক অস্তিত্বের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে (**এস.আর. বোম্মাই মামলা**)।
- **আঞ্চলিক দলগুলোর কোণঠাসা হওয়া:** একযোগে নির্বাচন হলে জাতীয় ইস্যুগুলো অনেক সময় স্থানীয় সমস্যাগুলোকে ছাপিয়ে যায়। IDFC **ইনস্টিটিউটের** একটি সমীক্ষা বলছে, একযোগে নির্বাচন হলে ভোটারদের কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলকে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা **৭৭%** থাকে।

৩. **লজিস্টিক এবং পরিচালনাগত জটিলতা**

- **EVM/VVPAT-এর অভাব:** নির্বাচন কমিশনের বর্তমানের তুলনায় প্রায় **দ্বিগুণ** ভোটদান যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। এতে বিশাল উৎপাদন খরচ এবং মেশিনগুলো রাখার জন্য গুদামজাতকরণের বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
- **নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন:** সারা দেশে একযোগে নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা (CAPF) নিশ্চিত করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার ওপর প্রভাব**

- **জনমতের সুযোগ কমে যাওয়া:** ধাপে ধাপে নির্বাচনগুলো একটি "মধ্যবর্তী পর্যালোচনা" হিসেবে কাজ করে, যা সরকারকে দায়বদ্ধ রাখে। ওনো (ONOE) চালু হলে সরকার হয়তো **"পাঁচ বছরে মাত্র একবার"** দায়বদ্ধ থাকবে।
- **ভোটারদের বিভ্রান্তি:** একই দিনে একাধিক ভোট দেওয়ার সময় ভোটাররা জাতীয় ইস্যু (যেমন- বিদেশ নীতি) এবং স্থানীয় ইস্যু (যেমন- জল/রাস্তা)-র মধ্যে পার্থক্য করতে সমস্যায় পড়তে পারেন।

৫. **রাজনৈতিক বিরোধিতা**

- **ঐকমত্যের অভাব:** অনেক আঞ্চলিক ও বিরোধী দল ওনো (ONOE)-কে একটি "এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র" বা "রাষ্ট্রপতি শাসিত" ব্যবস্থার দিকে পদক্ষেপ হিসেবে মনে করে। এর ফলে রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ এবং এই সংস্কার নিয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা দিচ্ছে।

উচ্চ-পর্যায়ের (কোবিন্দ) কমিটির সুপারিশ

রাম নাথ কোবিন্দ-এর সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি (২০২৪) একটি **পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির** সুপারিশ করেছে:

- **ধাপ ১:** লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন একযোগে করা। এর জন্য রাজ্যগুলোর অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
- **ধাপ ২:** সাধারণ নির্বাচনের **১০০ দিনের** মধ্যে স্থানীয় সংস্থার (পঞ্চায়েত/পৌরসভা) নির্বাচন করা। এর জন্য অন্তত অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
- **একক ভোটার তালিকা:** তিনটি স্তরের জন্যই একটি সাধারণ ভোটার তালিকা এবং একটি পরিচয়পত্র (EPIC) তৈরি করা।
- **অবশিষ্টাংশ মেয়াদ (Unexpired Term):** ত্রিশঙ্কু সংসদ বা অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নতুন কক্ষটি কেবল ৫ বছরের চক্রের **বাকি সময়ের** জন্যই কাজ করবে।

বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ব্যবস্থা

- **দক্ষিণ আফ্রিকা:** প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।
- **সুইডেন:** জাতীয় সংসদ (Riksdag), আঞ্চলিক কাউন্সিল এবং স্থানীয় কাউন্সিলের নির্বাচন একই দিনে (সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় রবিবার) হয়।
- **জার্মানি:** এখানে **"গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব"** (Constructive Vote of No-Confidence) ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ, বিকল্প কোনো সরকার প্রস্তুত না থাকা পর্যন্ত বর্তমান সরকারকে সরানো যায় না। এটি মেয়াদের পূর্ণতা নিশ্চিত করে।
- **ইন্দোনেশিয়া:** ইন্দোনেশিয়া দেখিয়েছে যে একযোগে বিশাল ভোটদান লজিস্টিক্যালি সম্ভব, কিন্তু এটি প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য (অতীতে কর্মীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল)।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন (দুই ধাপের পদ্ধতি)**

- **প্রথম পর্যায়:** লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে করা।
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** সাধারণ নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনগুলোকেও এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা।

২. **সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো**

- **নির্ধারিত তারিখ:** রাষ্ট্রপতি একটি "নির্ধারিত তারিখ" (যেমন- ২০২৯ সাল) ঘোষণা করবেন যেখান থেকে এই সমন্বয় শুরু হবে। ঐ তারিখের পর শেষ হওয়া বিধানসভাগুলোর মেয়াদ লোকসভার সাথে মিলিয়ে সমন্বয় করা হবে।
- **প্রয়োজনীয় সংশোধনী: ৮৩ এবং ১৭২ নম্বর অনুচ্ছেদে** প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে "অবশিষ্টাংশ মেয়াদ" সংজ্ঞায়িত করা, যাতে মাঝপথে সরকার ভেঙে গেলেও চক্রটি বজায় থাকে।

৩. **স্থিতিশীলতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা**

- **ত্রিশঙ্কু সংসদ সামলানো:** অনাস্থা প্রস্তাব বা ত্রিশঙ্কু সংসদের ক্ষেত্রে নতুন নির্বাচন কেবল ৫ বছরের চক্রের **বাকি সময়ের** জন্য হবে, পূর্ণ ৫ বছরের জন্য নয়।
- **জার্মান মডেলের প্রয়োগ:** জার্মান মডেলটি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে বিকল্প সরকার গঠন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সরকারকে অপসারণ করা যায় না।

৪. **লজিস্টিক প্রস্তুতি**

- **সরঞ্জাম বৃদ্ধি:** নির্বাচন কমিশনকে বিপুল পরিমাণ **EVM এবং VVPAT** সংগ্রহের পরিকল্পনা করতে হবে এবং দেশজুড়ে একক উইন্ডোতে নির্বাচনের জন্য বিশেষ গুদাম ও নিরাপত্তা প্রোটোকল তৈরি করতে হবে।

৫. **রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকমত্য গঠন**

- **দ্বিপাক্ষিক আলোচনা:** যেহেতু এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে, তাই একটি **যৌথ সংসদীয় কমিটি (JPC)** গঠন করে আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করা উচিত যাতে তাদের ভয় দূর করা যায়।
- **জনসচেতনতা:** ভোটারদের এর সুবিধা (সাশ্রয়, নিরবচ্ছিন্ন শাসন) এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত করতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাতে হবে।

উপসংহার

যদিও **এক দেশ এক নির্বাচন** প্রশাসনিক এবং আর্থিক দক্ষতার একটি দিকরেখা প্রদান করে, এর সাফল্য নির্ভর করে শাসনের স্থিতিশীলতা এবং **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** ও **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

Q. Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation-one election" principle.

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতি

ভূমিকা

জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, প্রবাসী ভারতীয় এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে ভারতের বিদেশ নীতিতে **পশ্চিম এশিয়া** (মধ্যপ্রাচ্য) অন্যতম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ভারত পশ্চিম এশিয়াকে তার **"সম্প্রসারিত প্রতিবেশী"** (Extended Neighbourhood) হিসেবে বিবেচনা করে। ভারত এখন এই অঞ্চলে কেবল নিষ্ক্রিয় কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়, বরং অত্যন্ত **সক্রিয় কৌশলগত সম্পৃক্ততার** দিকে এগিয়ে গেছে।

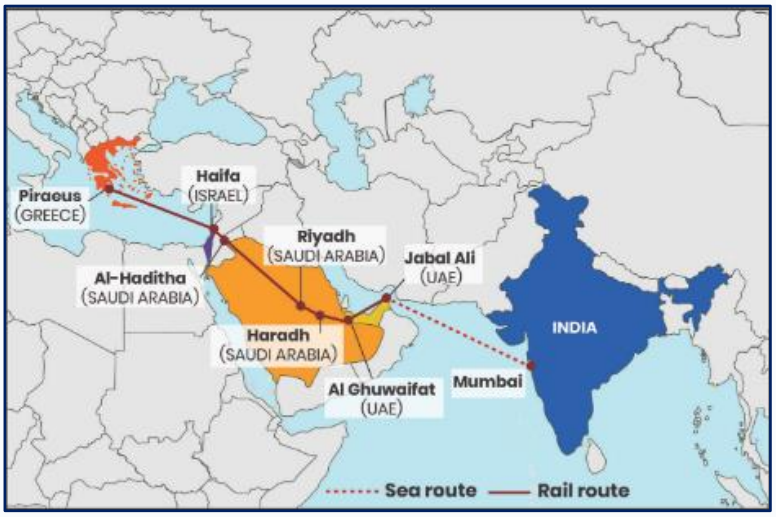

পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে

পশ্চিম এশিয়া বলতে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মাঝে অবস্থিত অঞ্চলটিকে বোঝায়, যাকে প্রায়ই **মধ্যপ্রাচ্য** বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে **আরব বিশ্ব, ইসরায়েল, ইরান** এবং **তুরস্কের** মতো দেশগুলো।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির মূল উপাদানসমূহ

১. **"ডি-হাইফেনেশন" (De-Hyphenation) কৌশল**

ভারত সফলভাবে প্রথাগত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সাথে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আলাদা করতে পেরেছে। ভারত একদিকে **ইসরায়েলের** সাথে **"বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব"** (প্রতিরক্ষা ও উচ্চ-প্রযুক্তির দিকে নজর দিয়ে) বজায় রাখছে, আবার একই সাথে কৌশলগত সংযোগের জন্য **ইরানের অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পরিষদের** সাথেও যোগাযোগ রাখছে। এটি ভারতকে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পক্ষ না নিয়ে নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তা ২.০: রূপান্তর এবং বাফারিং**

বর্তমানে ভারতের অপরিশোধিত তেলের প্রায় **৫৫%** উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এলেও, ভারতের পরিকল্পনা এখন আধুনিক হয়েছে:

- **কৌশলগত মজুদ (Strategic Reserves):** হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতার মতো সংকট মোকাবিলায় ভারত তার **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) দ্রুত সম্প্রসারণ করছে যাতে অন্তত ৯০ দিনের জরুরি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।
- **সবুজ শক্তি (Green Energy):** জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এবং সৌদি আরবের সাথে **গ্রিন হাইড্রোজেন** এবং সৌর শক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে।

৩. **সামুদ্রিক পথে "নিট নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)**

২০২৬ সালের সংঘাত যখন হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগরের বাণিজ্য পথকে হুমকির মুখে ফেলেছে, তখন ভারত **'অপারেশন সংকল্প'** (Operation Sankalp) শুরু করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনী এখন এই অঞ্চলে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে কাজ করছে এবং বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে নিয়মিত পাহারা দিচ্ছে যাতে জলদস্যু বা অন্য কোনো হামলা থেকে বাণিজ্য পথ রক্ষা করা যায়।

৪. **সংযোগ: "দুই-প্রবেশদ্বার" পদ্ধতি**

প্রথাগত রুটের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত দুটি আলাদা করিডোর বা পথ তৈরির চেষ্টা করছে:

- **IMEC (ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর):** উপসাগরীয় দেশ (UAE/সৌদি) এবং ইসরায়েলকে ব্যবহার করে ইউরোপের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- **INSTC এবং চাবাহার:** ইরানের **চাবাহার বন্দরকে** মধ্য এশিয়া এবং রাশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে পাকিস্তানের ওপর নির্ভর না করেই স্থলপথে বাণিজ্য বজায় রাখা যায়।

৫. **প্রবাসী কল্যাণ ও "রেমিট্যান্স কূটনীতি"**

উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসকারী **৯০ লক্ষের বেশি ভারতীয়র** নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে:

- **সংকট মোকাবিলা:** জরুরি ভিত্তিতে নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা রাখা (যেমন ২০২৬ সালের মন্ত্রিপরিষদ কমিটি)।
- **অর্থনৈতিক সুরক্ষা:** ভারতীয় কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সাথে **মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ** চুক্তি স্বাক্ষর করা।

৬. **বহুপাক্ষিক এবং "মিনি-ল্যাটারাল" অংশগ্রহণ**

ভারত আঞ্চলিক কাঠামোতে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে বিভিন্ন নতুন জোট ব্যবহার করছে:

- **I2U2 (ভারত, ইসরায়েল, UAE, USA):** খাদ্য নিরাপত্তা, পানি এবং মহাকাশ গবেষণার মতো যৌথ প্রকল্পগুলোতে নজর দেওয়া।

- **BRICS+ অংশগ্রহণ:** ব্রিকস-এ সৌদি আরব, ইরান এবং আমিরাতের অন্তর্ভুক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী আর্থিক কাঠামো এবং **"রুপি-বাণিজ্য"** (Rupee-Trade) চালুর চেষ্টা করা।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির সুবিধাসমূহ

১. **জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতা ও দামের স্থায়িত্ব**

সৌদি আরব এবং আমিরাতের মতো বড় উৎপাদকদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে ভারত **অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি ব্যবহারের** সুবিধা পায়। এই অংশীদারিত্ব ভারতের অভ্যন্তরে **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) তৈরিতেও সাহায্য করে, যার কিছু অংশ উপসাগরীয় বিনিয়োগ থেকে আসে।

২. **কৌশলগত "সেতুবন্ধন" ক্ষমতা**

ভারত বিশ্বের সেই অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যারা একই সাথে **ইসরায়েল, ইরান এবং আরব দেশগুলোর** সাথে কথা বলতে পারে। এই **"কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন"** ভারতকে সাহায্য করে:

- আঞ্চলিক সংকটে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে।
- কোনো গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে।
- ইসরায়েলের সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বজায় রেখেও ইরানের **চাবাহার বন্দরের** মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে।

৩. **অর্থনৈতিক লাভ: রেমিট্যান্স এবং বিনিয়োগ**

- **রেমিট্যান্স:** প্রবাসী ভারতীয়রা প্রতি বছর প্রায় **১২০ বিলিয়ন ডলার** দেশে পাঠান (২০২৫-২৬ এর হিসেব অনুযায়ী), যা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটাতে বড় ভূমিকা রাখে।
- **বিনিয়োগ:** সংযুক্ত আরব আমিরাতের ADIA এবং সৌদি আরবের PIF-এর মতো বড় বড় তহবিল এখন ভারতের অবকাঠামো, সবুজ শক্তি এবং ডিজিটাল স্টার্টআপগুলোতে বিশাল বিনিয়োগ করছে।

৪. **চীনের "স্ট্রিং অফ পার্লস" মোকাবিলা**

সক্রিয় পশ্চিম এশিয়া নীতি এই অঞ্চলকে চীনের একক প্রভাবে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। IMEC-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর একটি স্বচ্ছ এবং ঋণমুক্ত বিকল্প তৈরি করছে, যা ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে ভারসাম্য বজায় রাখে।

৫. **উন্নত সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

অপারেশন সংকল্প এবং যৌথ নৌ-মহড়ার মাধ্যমে ভারত ওমানের **ডুকম** (Duqm) এর মতো জায়গায় লজিস্টিক সুবিধা পেয়েছে। এটি উত্তর আরব সাগরে জলদস্যু বা ড্রোন হামলা থেকে বাণিজ্য পথ রক্ষা করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

৬. **খাদ্য ও প্রযুক্তি নিরাপত্তা**

I2U2 গ্রুপের মাধ্যমে ভারত নিচের সুবিধাগুলো পাচ্ছে:

- **ইসরায়েলি প্রযুক্তি:** শুষ্ক জমিতে চাষাবাদ এবং পানি পুনর্ব্যবহারের জন্য।
- **সংযুক্ত আরব আমিরাতের মূলধন:** ভারতে **'ফুড পার্ক'** বা খাদ্য উদ্যান তৈরির জন্য।
- **ফলাফল:** এটি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং একই সাথে ভারতীয় কৃষকদের আয় ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"চোকপয়েন্ট" বা কৌশলগত পথের পক্ষাঘাত:** ভারতের মোট আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের **৪০-৫০%** এবং এলপিজি (LPG)-এর প্রায় **৯০% হরমুজ প্রণালীর** মধ্য দিয়ে আসে। বর্তমান নৌ-অবরোধ এবং ইরান কর্তৃক এই জলপথ বন্ধের হুমকির ফলে ভারত এক অস্তিত্ব রক্ষা করার মতো জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছে।

২. **সংকটের মুখে সংযোগ ব্যবস্থা (IMEC বনাম বাস্তবতা):** ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) মধ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে **ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর (IMEC)** বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। IMEC-এর এই ব্যর্থতা ভারতকে পুনরায় **সুয়েজ খাল** (যেখানে হুথি হামলার ভয় রয়েছে) অথবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল **কেপ অফ গুড হোপ** রুটের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করছে।

৩. **প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে সংকট (The Diaspora Dilemma):** উপসাগরীয় দেশগুলোতে প্রায় **১০ মিলিয়ন (১ কোটি)** ভারতীয় বসবাস করেন, যার ফলে যেকোনো বড় আঞ্চলিক যুদ্ধ ভারতের জন্য একটি লজিস্টিক দুঃস্বপ্ন।

- **উদ্ধার অভিযান:** ২০২৬ সালের মার্চের শুরুতে ৫২,০০০-এর বেশি ভারতীয়কে সরিয়ে নেওয়া হলেও, একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু হলে তা সামলাতে **'অপারেশন রাহাত'**-এর চেয়েও বড় কোনো অভিযানের প্রয়োজন হবে।
- **অর্থনৈতিক ধাক্কা:** উপসাগরীয় দেশগুলোতে উৎপাদন কমলে বছরে **১২০ বিলিয়ন ডলারের** বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

৪. **আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থিক চাপ:** ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেলে **১০০-১২০ ডলারে** পৌঁছানোর ফলে ভারতে "কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন" বা উৎপাদন ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে।

- **সার সংকট:** ভারত তার ইউরিয়া এবং NPK সারের ৪০% উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করে। এই সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় সরকারের ভর্তুকির বোঝা বাড়ছে এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে।
- **টাকার মানের ওপর চাপ:** আমদানি বিল বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় রুপির মান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে (উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে প্রতি ডলারের বিপরীতে টাকার মান **৯২-৯৫ টাকা** হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে)।

৫. **চীনের "মধ্যস্থতা" কূটনীতি:** চীন বর্তমানে নিজেকে এই অঞ্চলের প্রধান "শান্তি স্থাপনকারী" হিসেবে তুলে ধরছে (যেমন: সৌদি-ইরান চুক্তি)। একই সাথে বেইজিং তার **'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)** প্রকল্পের মাধ্যমে গোয়াদর এবং জেবেল আলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে।

৬. **ডি-হাইফেনেশন (De-hyphenation) বা ভারসাম্য রক্ষার চাপ: ইসরায়েলের** সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি বজায় রাখা এবং একই সাথে (চাবাহার বন্দরের স্বার্থে) **ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিলের** সাথে সুসম্পর্ক রাখা ক্রমাগত কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারত তার এই "কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন" বা নিরপেক্ষ অবস্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ সমালোচনা এবং আমেরিকা-নেতৃত্বাধীন দেশগুলোর চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) শক্তিশালী করা:** ভারতকে তার SPR প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে যাতে অন্তত **৯০ দিনের জ্বালানি মজুদ** নিশ্চিত করা যায়। এই রিজার্ভগুলোতে সৌদি আরামকো এবং আমিরাতের আদনক (ADNOC)-এর মতো কোম্পানিকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার সাথে যুক্ত থাকে।

২. **বিকল্প সংযোগ ব্যবস্থা সচল করা:** IMEC স্থবির হয়ে পড়ায় ভারতকে **চাবাহার বন্দরের** মাধ্যমে **ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর (INSTC)**-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই "মধ্য করিডোর" শক্তিশালী করলে তা লোহিত সাগরের সংকটের বিপরীতে একটি ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সাথে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য নিশ্চিত করবে।

৩. **"রুপি-ট্রেড" বা টাকায় বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করা:** ডলারের ওপর চাপ (₹৯২-৯৫/$) এবং সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় ভারতকে **লোকাল কারেন্সি সেটেলমেন্ট** (LCS) বা স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন ব্যবস্থা আরও প্রাতিষ্ঠানিক করতে হবে।

৪. **জ্বালানি ২.০ (গ্রিন হাইড্রোজেন) দিকে রূপান্তর:** ভারতকে তেলের "ক্রেতা" থেকে সরে এসে **গ্রিন হাইড্রোজেনের "অংশীদার"** হতে হবে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সস্তা সৌর শক্তি ব্যবহার করে যৌথভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকাঠামো তৈরি করলে ভারত তার "নেট-জিরো" লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে এবং আমদানির আর্থিক চাপও কমবে।

৫. **বহুপাক্ষিক "নিরাপত্তা কাঠামো":** I2U2 এবং BRICS+ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভারত উত্তর আরব সাগরে একটি "কোড অফ কন্ডাক্ট" বা আচরণবিধির প্রস্তাব দিতে পারে। এটি ভারতকে এই অঞ্চলের প্রধান নিরাপত্তা প্রদানকারী এবং আমেরিকা-ইসরায়েল অক্ষ ও ইরানের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

উপসংহার

ভারতকে একটি সাধারণ "ক্রেতা-বিক্রেতা" সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে **"কৌশলগত অংশীদার"** (Strategic Stakeholder) হতে হবে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি ও সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য IMEC এবং **গ্রিন হাইড্রোজেন** প্রকল্পগুলোকে হাতিয়ার করে এই অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করতে হবে।

Q. The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian Countries.

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. ভারতের আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ভূমিকা

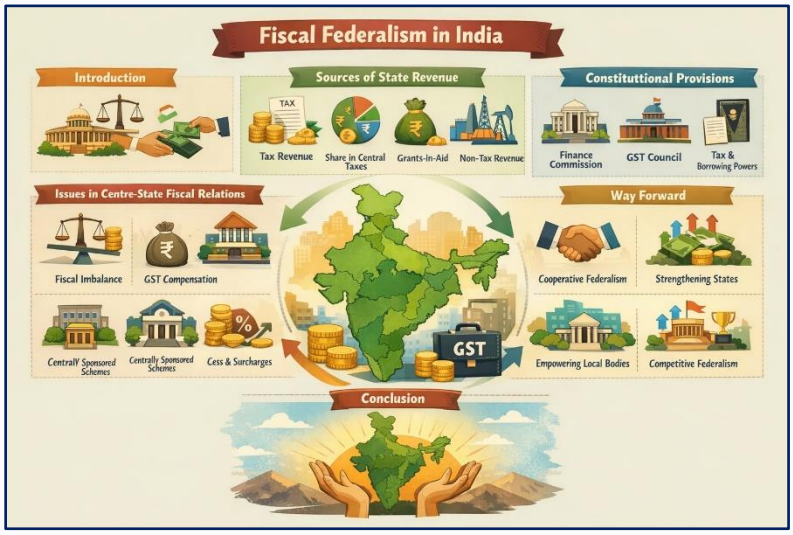

- **সংজ্ঞা:** আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা Fiscal Federalism হলো সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আয় (রাজস্ব) এবং ব্যয় কীভাবে বণ্টিত হবে তার একটি বিশেষ অধ্যয়ন।
- **প্রকৃতি:** ভারত একটি **আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federal)** আর্থিক কাঠামো অনুসরণ করে। যদিও কেন্দ্রের কাছে আয়ের অধিক স্থিতিস্থাপক উৎস (যেমন আয়কর, কর্পোরেট কর) রয়েছে, কিন্তু গ্রাউন্ড-লেভেল বা **তৃণমূল স্তরের ব্যয়ের** (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি) সিংহভাগ দায়িত্ব বহন করে রাজ্যগুলো।
- **মাসগ্রেভ-এর তিনটি কাজ:** এর লক্ষ্য হলো সম্পদের **বরাদ্দকরণ** (জনকল্যাণমূলক পরিষেবা), **বণ্টন** (সাম্য বজায় রাখা) এবং **স্থিতিশীলতা** (সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য) নিশ্চিত করা।

আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান

ভারতের আইনি কাঠামো মূলত সংবিধানের **দ্বাদশ খণ্ডে (অনুচ্ছেদ ২৬৮-২৯৩)** বর্ণিত আছে।

১. **কর আরোপের ক্ষমতার বিভাজন (ভিত্তি)**

- **অনুচ্ছেদ ২৪৬ (সপ্তম তফসিল):**
  - **কেন্দ্রীয় তালিকা (তালিকা-১):** আয়কর (কৃষি ব্যতীত), শুল্ক (Customs), কর্পোরেট কর এবং তামাক ও পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির ওপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ধার্য করার একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে।
  - **রাজ্য তালিকা (তালিকা-২):** ভূমি রাজস্ব, মদের ওপর রাজ্য আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং কৃষি আয়ের ওপর কর ধার্য করার একচেটিয়া ক্ষমতা রাজ্যের হাতে।
  - **যুগ্ম তালিকা (তালিকা-৩):** কর আরোপের ক্ষমতা খুবই সামান্য; মূলত নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে।
- **অনুচ্ছেদ ২৪৬A (১০১তম সংশোধনী):** এটি একটি **"বিশেষ বিধান"** যা সপ্তম তফসিলকে এড়িয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই একই লেনদেনের ওপর GST ধার্য করার অনুমতি দেয়।

২. **রাজস্ব বণ্টন (পদ্ধতি)**

- **অনুচ্ছেদ ২৬৮:** কেন্দ্র কর ধার্য করে কিন্তু রাজ্যগুলো তা সংগ্রহ ও ভোগ করে (যেমন- স্ট্যাম্প ডিউটি)।
- **অনুচ্ছেদ ২৬৯:** কেন্দ্র কর ধার্য ও সংগ্রহ করে কিন্তু তা রাজ্যগুলোকে অর্পণ করা হয় (যেমন- আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ওপর কর, যদিও এখন এটি মূলত IGST-র অন্তর্ভুক্ত)।
- **অনুচ্ছেদ ২৭০ (বিভাজ্য তহবিল):** সমস্ত কেন্দ্রীয় করের (সেস ও সারচার্জ বাদে) **"নিট লব্ধ অর্থ"** কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করা বাধ্যতামূলক।

- **বর্তমান অবস্থা: ১৬তম অর্থ কমিশন** ২০২৬-৩১ সালের জন্য উল্লম্ব হস্তান্তরের (Vertical Devolution) হার **৪১%** বজায় রেখেছে।

- **অনুচ্ছেদ ২৭১:** কেন্দ্রের **সেস** (Cess) এবং **সারচার্জ** (Surcharge) ধার্য করার ক্ষমতা। এগুলি বিভাজ্য তহবিলের অংশ নয়, অর্থাৎ কেন্দ্র এই আয়ের ১০০% নিজের কাছে রাখে। এটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি প্রধান **বিরোধের জায়গা**।

৩. **আর্থিক অনুদান (ঘাটতি পূরণ)**

- **অনুচ্ছেদ ২৭৫ (বিধিবদ্ধ অনুদান):** অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রাজ্যগুলোকে বাধ্যতামূলক অনুদান দেওয়া হয়। এটি ভারতের **সঞ্চিত তহবিল** (Consolidated Fund of India) থেকে প্রদান করা হয়।
- **অনুচ্ছেদ ২৮২ (বিবেচনামূলক অনুদান):** কেন্দ্র বা রাজ্য যে কোনো "জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে" অনুদান দিতে পারে। বেশিরভাগ **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম** (CSS) এই অনুচ্ছেদের অধীনে অর্থায়ন করা হয়।
  - **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** ১৬তম অর্থ কমিশন এখন কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক অনুদানের (Performance-linked grants) দিকে ঝুঁকছে (যেমন- স্থানীয় সংস্থাগুলোর ২০% অনুদান এখন কাজের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল)।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ**

- **অনুচ্ছেদ ২৮০ (অর্থ কমিশন):** এটি একটি আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা যা প্রতি ৫ বছর অন্তর কর বণ্টনের সূত্র নির্ধারণের জন্য গঠিত হয়।
- **অনুচ্ছেদ ২৭৯A (GST কাউন্সিল):** যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এখানে সিদ্ধান্তের জন্য **৭৫% সংখ্যাগরিষ্ঠতা** প্রয়োজন, যেখানে কেন্দ্রের হাতে ১/৩ ভাগ এবং রাজ্যগুলোর হাতে ২/৩ ভাগ ভোটের ক্ষমতা থাকে।

৫. **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ঋণ গ্রহণ**

- **অনুচ্ছেদ ২৯২:** সংসদ নির্ধারিত সীমার মধ্যে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের জামানতে কেন্দ্রের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা।
- **অনুচ্ছেদ ২৯৩:** রাজ্যগুলোর ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা।
  - **সীমাবদ্ধতা:** যদি কোনো রাজ্যের কেন্দ্রের কাছে বকেয়া ঋণ থাকে, তবে কেন্দ্রের সম্মতি ছাড়া সেই রাজ্য নতুন ঋণ নিতে পারে না (**অনুচ্ছেদ ২৯৩(৩)**)।
  - **সাম্প্রতিক সংঘাত:** কেন্দ্র এই নিয়ম ব্যবহার করে রাজ্যের ঋণের সীমার মধ্যে **"অফ-বাজেট বোরোয়িং"** (বাজেট বহির্ভূত ঋণ)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা কেরালা সহ অনেক রাজ্য চ্যালেঞ্জ করেছে।

রাজ্যের আয়ের উৎস

১. **রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব** (SOTR)

রাজ্যের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **রাজ্য GST (SGST):** আয়ের একক বৃহত্তম উৎস। এটি রাজ্যের ভেতরে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের ওপর ধার্য করা করের অংশ।
- **রাজ্য আবগারি শুল্ক:** মূলত মানুষের পানের জন্য ব্যবহৃত মদ এবং মাদকদ্রব্যের ওপর ধার্য করা হয়।
- **পেট্রোলিয়ামের ওপর ভ্যাট** (VAT)**:** পেট্রোল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল GST-র বাইরে থাকায় রাজ্যগুলো এগুলোর ওপর ভ্যাট ধার্য করে।
- **স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি:** সম্পত্তি হস্তান্তর এবং আইনি নথিপত্রের ওপর ধার্য করা হয়।
- **যানবাহন কর:** মোটর যানবাহনের ওপর এককালীন বা বার্ষিক কর।
- **ভূমি রাজস্ব:** কৃষি জমির ওপর কর (ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এর অংশ কমেছে)।

- **বিদ্যুৎ শুল্ক:** বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিক্রির ওপর কর।

২. **রাজ্যের নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব**

এটি প্রায়ই অবহেলিত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে:

- **ব্যবহারকারী চার্জ (User Charges):** সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবার ফি (যেমন- সেচ কর, সরকারি কলেজের টিউশন ফি, হাসপাতালের ফি)।
- **সুদ প্রাপ্তি:** রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (PSU) বা স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দেওয়া ঋণের ওপর অর্জিত সুদ।
- **লভ্যাংশ ও মুনাফা:** রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত আয়।
- **খনিজ রয়্যালটি:** খনিজ উত্তোলনের জন্য খনি সংস্থাগুলোর দেওয়া ফি (ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
- **লটারি:** কেরালা এবং সিকিমের মতো রাজ্যগুলোর জন্য এটি আয়ের বড় উৎস।

৩. **কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ**

- **কর হস্তান্তর (অনুচ্ছেদ ২৭০):** কেন্দ্রীয় করের (আয়কর, কর্পোরেট কর, CGST ইত্যাদি) **৪১%** অংশ রাজ্যগুলো পায়।
- **আর্থিক অনুদান (অনুচ্ছেদ ২৭৫):**
  - **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান:** কর হস্তান্তরের পরেও যে রাজ্যগুলো আর্থিক ঘাটতিতে থাকে, তাদের এটি দেওয়া হয়।
  - **স্থানীয় সংস্থা অনুদান:** পঞ্চায়েত এবং শহরতলি এলাকার (RLBs/ULBs) জন্য বরাদ্দ।
- **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম (CSS):** নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য (যেমন- জল জীবন মিশন, পিএম-কিষাণ) অনুচ্ছেদ ২৮২-এর অধীনে অর্থ পাঠানো হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের সমস্যাগুলো

১. **উল্লম্ব আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (Vertical Fiscal Imbalance):** কেন্দ্র মোট রাজস্বের প্রায় **৬০%** সংগ্রহ করে, কিন্তু রাজ্যগুলোকে মোট জনব্যয়ের **৬০%** সম্পন্ন করতে হয়। এটি রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

২. **সেস (Cess) এবং সারচার্জের বৃদ্ধি: অনুচ্ছেদ ২৭১**-এর অধীনে, কেন্দ্র বিভিন্ন সেস (যেমন—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস) ধার্য করে যা রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না। এটি কার্যত **"বিভাজ্য তহবিল" (Divisible Pool)** কমিয়ে দিয়েছে।

- **দ্রষ্টব্য:** ১৬তম অর্থ কমিশন সম্প্রতি একটি **"গ্র্যান্ড বারগেন" (Grand Bargain)** বা বড় চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে সেসগুলোকে যদি সাধারণ তহবিলে যুক্ত করা হয়, তবে রাজ্যগুলো কর হস্তান্তরের শতাংশ কিছুটা কমাতে রাজি হতে পারে।

৩. **স্বায়ত্তশাসনের ক্ষয় (GST): "এক দেশ, এক কর"** ব্যবস্থা অধিকাংশ পণ্যের ওপর করের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা রাজ্যগুলোর থেকে কেড়ে নিয়েছে, যার ফলে তারা কেন্দ্রের **"পেনশনভোগী"**-তে পরিণত হয়েছে।

৪. **ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা (অনুচ্ছেদ ২৯৩):** কেন্দ্র একটি **নিট ঋণের সীমা (Net Borrowing Ceiling - NBC)** আরোপ করে। কেরালা সহ অনেক রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, এই যুক্তিতে যে এটি তাদের নিজস্ব অর্থ ব্যবস্থাপনার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

৫. **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম (CSS):** রাজ্যগুলোর মতে, এই স্কিমগুলো (যেমন—MGNREGA বা আয়ুষ্মান ভারত) সবার জন্য একই রকম বা "One-size-fits-all"। এটি রাজ্যগুলোকে তাদের সীমিত সম্পদ কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকারের কাজে ব্যয় করতে বাধ্য করে, যেখানে প্রায়ই **৬০:৪০** বা **৯০:১০** অনুপাতে অর্থায়ন করতে হয়।

ভবিষ্যৎ পথ: আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

১. **সেস নিরপেক্ষকরণ (Cess Neutralization):** প্রধান সেসগুলোকে বিভাজ্য তহবিলের সাথে যুক্ত করে একটি **"বড় চুক্তি"** বাস্তবায়ন করা। এটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং মোট কর রাজস্বে রাজ্যগুলোর ভাগ কমে যাওয়া রোধ করবে।

২. **GST ২.০ সংস্কার:** একটি সহজতর **দ্বি-স্তরীয় কর কাঠামো** (যেমন—৫% এবং ১৮%) প্রবর্তন করা এবং পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎকে GST-র আওতায় আনার একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা, যাতে উৎপাদন খরচ কমে এবং রাজস্বের ভিত্তি প্রশস্ত হয়।

৩. **সর্বনিম্ন রাজস্বের নিশ্চয়তা (Revenue Floor Guarantee):** দক্ষতা-ভিত্তিক মানদণ্ডের (যেমন—GDP-তে অবদান) কারণে তৈরি হওয়া **"উত্তর-দক্ষিণ"** বিভেদ কমাতে কেন্দ্রের উচিত নিশ্চিত করা যে, পরিবর্তনের সময়ে কোনো রাজ্যের প্রকৃত রাজস্ব পূর্ববর্তী স্তরের নিচে নামবে না।

৪. **স্থানীয় সংস্থার ক্ষমতায়ন:** পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলোর জন্য **"অনুদান-নির্ভরতা"** কমিয়ে **"আর্থিক স্বায়ত্তশাসন"**-এর ওপর জোর দেওয়া। স্থানীয় সম্পত্তি কর সংগ্রহ বাড়াতে রাজ্যগুলোকে অবশ্যই **রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC)**-এর রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. **ফ্লেক্সি-সিএসএস মডেল (Flexi-CSS Model):** কঠোর কেন্দ্রীয় স্কিমগুলোর পরিবর্তে **"ফলাফল-ভিত্তিক নির্দিষ্ট অনুদান"** চালু করা। এটি রাজ্যগুলোকে স্থানীয় ভৌগোলিক এবং জনতাত্ত্বিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো সাজানোর নমনীয়তা দেবে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক ঐকমত্য:** ঋণ সীমা এবং বাজেট বহির্ভূত দায় নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (অনুচ্ছেদ ২৬৩)**-কে পুনরুজ্জীবিত করা। এর ফলে আর্থিক দ্বন্দ্বগুলো বিচারবিভাগের পরিবর্তে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

ভারতের আর্থিক কাঠামোকে **"কেন্দ্রীভূত সমন্বয়"** থেকে **"ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্বে"** রূপান্তর করতে হবে। ১৬তম অর্থ কমিশনের দক্ষতা-ভিত্তিক মানদণ্ডকে কাজে লাগিয়ে এবং সেসগুলোকে মূল তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি আর্থিকভাবে স্থিতিস্থাপক **"বিকশিত ভারত"** গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?

3.1.2. ভারতের জন্য টেকসই জ্বালানি

ভূমিকা

টেকসই শক্তি বলতে এমন শক্তিকে বোঝায় যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করে না। এটি একই সাথে **জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা** এবং **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করে।

টেকসই শক্তির মূল নীতিসমূহ

(ক) **পরিবেশগত স্থায়িত্ব:** শক্তি উৎপাদন এমনভাবে হতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি এবং **কার্বন নিঃসরণ** সর্বনিম্ন হয়।

(খ) **জ্বালানি নিরাপত্তা:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন এবং **নির্ভরযোগ্য সরবরাহ** নিশ্চিত করা।

(গ) **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব:** শক্তি ব্যবস্থা অবশ্যই সাশ্রয়ী হতে হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে হবে।

(ঘ) **সামাজিক ন্যায়বিচার:** সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে শক্তির **সহজলভ্যতা** এবং **সাশ্রয়ী মূল্য** নিশ্চিত করা।

কেন ভারতের জন্য টেকসই শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

১. **অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা (আমদানি বিল সংকট)**

- **আর্থিক স্থিতিশীলতা:** ভারত প্রতি বছর অপরিশোধিত তেল আমদানিতে **১৬০ বিলিয়ন ডলারের** বেশি খরচ করে। বৈদেশিক মুদ্রার এই বিশাল ব্যয় সরাসরি ভারতীয় **টাকার মূল্যের** ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** তেলের উচ্চমূল্য **"আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি"** সৃষ্টি করে, যা খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু টেকসই শক্তি (সৌর/বায়ু) উৎপাদনে কোনো জ্বালানি খরচ নেই, যা দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন**

- **"হরমুজ" প্রণালীর ঝুঁকি:** ভারতের মোট তেলের ৬০% আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। পারস্য উপসাগরে কোনো যুদ্ধ বা উত্তেজনা দেখা দিলে তা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে **পঙ্গু** করে দিতে পারে।
- **কৌশলগত স্বাধীনতা:** নবায়নযোগ্য শক্তি এবং **গ্রিন হাইড্রোজেন** ব্যবহার করে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে ভারতের জ্বালানি নির্ভরতা কমবে। এর ফলে ভারত কোনো প্রকার **জ্বালানি ব্ল্যাকমেইল** বা চাপের মুখে না পড়ে একটি নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বজায় রাখতে পারবে।

৩. **পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত বাধ্যবাধকতা**

- **বায়ুর গুণমান:** বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৪টিই ভারতে অবস্থিত। কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরে আসলে PM2.5-এর মাত্রা কমবে, যা স্বাস্থ্যসেবা খাতে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করবে।
- **জলবায়ু নেতৃত্ব:** বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম CO_2 **নিঃসরণকারী** দেশ হিসেবে, ২০৭০ সালের মধ্যে **"নেট জিরো"** লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা ভারতের বৈশ্বিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি ইউরোপ বা আমেরিকার মতো দেশগুলোর আরোপিত **"কার্বন বর্ডার ট্যাক্স"** এড়াতেও সাহায্য করবে।

৪. **"জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ" এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

- **সবুজ কর্মসংস্থান (Green Jobs):** জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অনেক বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের এই খাতে উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মিলিয়ে প্রায় **৩৪ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান** সৃষ্টি হতে পারে।
- **গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন:** বিকেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প (PM-KUSUM) কৃষকদের **"উর্জাদাতা"** বা শক্তি সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তুলছে, যা গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

ভারতে টেকসই শক্তির প্রধান উৎসসমূহ

১. *সৌর শক্তি (শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা)*

ভারতের পরিবেশবান্ধব জ্বালানি পরিবর্তনের প্রধান স্তম্ভ হলো সৌর শক্তি। জাপানকে পেছনে ফেলে ভারত বর্তমানে বিশ্বের **তৃতীয় বৃহত্তম সৌর শক্তি উৎপাদনকারী** দেশ।

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ১৪৩.৬ গিগাওয়াট (GW)।
- **মাটিতে স্থাপিত প্রকল্প:** প্রায় ১০৯.৫ গিগাওয়াট। গুজরাটের **খাবড়া (Khavda)** পার্কের মতো বিশাল প্রকল্পগুলো এর নেতৃত্বে রয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তি অঞ্চল হতে চলেছে।

- **ছাদ ভিত্তিক সৌর প্রকল্প (Rooftop Solar):** এর ক্ষমতা প্রায় ২৫ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনার** মাধ্যমে ১ কোটি বাড়িতে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্য এই গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
- **ভাসমান সৌর প্রকল্প (Floating Solar):** জমি বাঁচাতে এবং জলের বাষ্পীভবন কমাতে জলাধারগুলোতে (যেমন- ওমকারেশ্বর বাঁধ) এই প্রকল্প বাড়ানো হচ্ছে।

২. *গ্রিন হাইড্রোজেন (কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের হাতিয়ার)*

- **উৎপাদন অবস্থা:** উৎপাদন খরচ প্রতি কেজিতে **৪ ডলারের নিচে** নেমে এসেছে।
- **কৌশলগত হাব:** ভারতের তিনটি বন্দরকে "গ্রিন হাইড্রোজেন হাব" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে: **কাণ্ডলা (গুজরাট), তুতিকোরিন (তামিলনাড়ু) এবং পারাদীপ (ওড়িশা)**।
- UPSC **ফ্যাক্ট:** আমদানিকৃত গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত ইস্পাত এবং সার কারখানার মতো ভারী শিল্পগুলোতে গ্রিন হাইড্রোজেন ব্যবহার করছে।

৩. *বায়ু শক্তি (স্থলভাগ ও উপকূলীয়)*

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ৫৪ গিগাওয়াট (স্থলভাগে)।
- **উপকূলীয় অগ্রগতি:** ভিজিএফ (VGF) প্রকল্পের অধীনে গুজরাট এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে প্রথম ১ গিগাওয়াট অফশোর বা উপকূলীয় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।
- **হাইব্রিডাইজেশন:** গ্রিডে ২৪ ঘণ্টা স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এখন **"সৌর-বায়ু হাইব্রিড"** প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

৪. *পারমাণবিক শক্তি (ভিত্তিগত শক্তির স্তম্ভ)*

২০২৫ সালের **শান্তি (SHANTI) আইনের** অধীনে ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই খাতে সীমিত বেসরকারি অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ৮.৮ গিগাওয়াট।
- **ভারত স্মল রিঅ্যাক্টর (BSR):** ২২০ মেগাওয়াটের দেশীয় রিঅ্যাক্টরগুলো ভারী শিল্পের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- SMR-55: ভারতের প্রথম বিশেষায়িত ৫৫ মেগাওয়াট **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR)** বর্তমানে নির্মাণাধীন, যা বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ব্যবহারের জন্য তৈরি।

৫. *বায়ো-এনার্জি ও বৃত্তাকার অর্থনীতি*

- **ইথানল মিশ্রণ:** ২০২৫ সালে পেট্রোলে **২০% ইথানল মিশ্রণ (E20)** অর্জিত হয়েছে। এখন নির্দিষ্ট কিছু শহরে বিশুদ্ধ ইথানল (E100) চালিত যানবাহনের পরীক্ষা চলছে।
- **কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG):** খড় বা কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহার করে গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে, যা রান্নার গ্যাসের (LPG) আমদানি বিল এবং দূষণ উভয়ই কমাবে।

প্রধান সরকারি নীতি ও উদ্যোগসমূহ

১. **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর: মুফ্ত বিজলি যোজনা (২০২৪-২০২৭):** বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করা।

২. **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন (NGHM):** ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য।

৩. **শান্তি (SHANTI) আইন, ২০২৫:** পারমাণবিক শক্তিতে সরকারি একচেটিয়া আধিপত্য শেষ করে বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং SMR প্রযুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

৪. **পিএম-কুসুম (PM-KUSUM):** কৃষিক্ষেত্রে ডিজেলের ব্যবহার বন্ধ করে সৌর পাম্প সরবরাহ করা এবং কৃষকদের **"উর্জাদাতা"** হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. **পিএম ই-ড্রাইভ (PM e-DRIVE) প্রকল্প (২০২৪-২০২৮):** ইলেকট্রিক গাড়ি (২-হুইলার, ৩-হুইলার, ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স) এবং চার্জিং নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত করা।

৬. **জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতি (২০২২ সংশোধনী):** ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে পেট্রোলে ২০% ইথানল মিশ্রণ নিশ্চিত করা।

টেকসই শক্তি অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **সঞ্চয় পরিকাঠামোর অভাব:** দিনের বেলার অতিরিক্ত সৌর শক্তি রাতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় **ব্যাটারি (BESS)** এবং **পাম্পড হাইড্রো** স্টোরেজের অভাব রয়েছে।
- **খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভরতা:** ব্যাটারি এবং সোলার প্যানেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় **লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ** উপাদানের জন্য ভারত বিদেশের ওপর নির্ভরশীল।
- **অধিক মূলধনী খরচ:** এই প্রকল্পগুলোতে শুরুতে অনেক বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় এবং উচ্চ সুদের হারের কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।
- **ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিরোধ:** সৌর ও বায়ু খামারের জন্য বিশাল জমির প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় কৃষিজমি বা জীববৈচিত্র্যের (যেমন- গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড পাখি) সাথে সংঘর্ষ তৈরি করে।
- **বিদ্যুৎ সঞ্চালন সমস্যা:** বেশিরভাগ সবুজ শক্তি পশ্চিম ভারতে (রাজস্থান/গুজরাট) উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা সারাদেশে পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত **গ্রিন এনার্জি করিডোর** এখনও তৈরি হয়নি।
- **ডিসকম (DISCOM)-এর আর্থিক অবস্থা:** সরকারি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো ঋণে ডুবে থাকায় তারা নতুন গ্রিন এনার্জি চুক্তিতে উৎসাহ পায় না।
- **প্রযুক্তির জন্য আমদানি নির্ভরতা:** "মেক ইন ইন্ডিয়া" সত্ত্বেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেল এবং হাইড্রোজেনের যন্ত্রাংশের জন্য এখনও আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সমন্বিত স্টোরেজ নীতি:** সৌর ও বায়ু শক্তির অস্থিরতা সামলাতে পাম্পড হাইড্রো এবং ব্যাটারি স্টোরেজ দ্রুত চালু করা।
- **খনিজ নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব:** লিথিয়াম ও কোবাল্টের দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ নিশ্চিত করতে KABIL-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে বিদেশের সাথে খনিজ চুক্তি করা।
- **গ্রিন হাইড্রোজেনের প্রসার:** ইস্পাত ও সিমেন্টের মতো ভারী শিল্পে গ্রিন হাইড্রোজেনের ব্যবহার পরীক্ষামূলক স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে নিয়ে যাওয়া।
- **গ্রিড আধুনিকীকরণ:** স্মার্ট গ্রিড এবং গ্রিন এনার্জি করিডোর সম্পন্ন করা যাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নষ্ট না হয়।
- **দেশীয় উৎপাদনে উৎসাহ: পিএলআই (PLI)** স্কিমের মাধ্যমে ভারতে উন্নত সোলার সেল এবং হাইড্রোজেনের যন্ত্রাংশ তৈরিতে জোর দেওয়া।
- **কৃষির সাথে সমন্বয়:** কৃষিজমির ওপর সোলার প্যানেল বসিয়ে একই জমি থেকে বিদ্যুৎ ও ফসল উভয়ই পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

ভারতকে জ্বালানি নির্ভরতা থেকে **জ্বালানি সার্বভৌমত্বের** দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গ্রিন হাইড্রোজেন, ছোট পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর (SMR) এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি স্থিতিশীল ও 'নেট-জিরো' ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই হবে মূল লক্ষ্য, যা দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব রাজনীতির তেলের দামের ওঠা-নামা থেকে রক্ষা করবে।

Q. In light of rising geopolitical tensions affecting global oil supply, evaluate the role of sustainable energy in strengthening India's energy security.

3.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.2.1. সার্বভৌম এআই: ডিজিটাল যুগে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন

প্রেক্ষিত

বর্তমান সময়ে **"কম্পিউট কলোনিয়ালিজম"** বা "গণনাগত উপনিবেশবাদ"-এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে **সার্বভৌম এআই**-এর ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমানে এআই-এর ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু উন্নত দেশের (গ্লোবাল নর্থ) বড় কর্পোরেশনের হাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সার্বভৌম এআই কী?

সার্বভৌম এআই বলতে একটি দেশের নিজস্ব **অবকাঠামো, ডেটা** (তথ্য) এবং **মেধাকে** কাজে লাগিয়ে এআই প্রযুক্তি তৈরি, ব্যবহার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়, যাতে কোনো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করতে না হয়।

সার্বভৌম কাঠামোর চারটি প্রধান স্তম্ভ:

১. **ডেটা সার্বভৌমত্ব:** ভারতের তথ্য দেশের সীমানার ভেতরে রাখা এবং এমন মডেল তৈরি করা যা আমাদের দেশের স্থানীয় সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য বুঝতে পারে।

২. **কম্পিউট সার্বভৌমত্ব:** বিদেশি সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয়ভাবে **"কম্পিউট ব্যাঙ্ক"** (GPUs) স্থাপন করা।

৩. **অ্যালগরিদমিক সার্বভৌমত্ব:** এমন মূল এআই মডেল তৈরি করা যা "পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তি" বা ভ্রান্ত ধারণার বদলে ভারতীয় **সংস্কৃতি** ও **ভাষাকে** সঠিকভাবে তুলে ধরবে।

৪. **গভর্নেন্স বা শাসন সার্বভৌমত্ব:** এআই-এর নৈতিকতা ও নিয়মকানুন যেন ভারতের নিজস্ব আইনি কাঠামোর (যেমন- DPDP Act 2023) ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

ভারতের কেন সার্বভৌম এআই প্রয়োজন?

১. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ("ডিজিটাল উপনিবেশবাদ" বন্ধ করা)**

- **ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** এটি আমেরিকা বা চীনের এআই সিস্টেমের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমায়।
- **নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** বিদেশি শক্তি যদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বা ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করে, তবুও যেন আমাদের প্রতিরক্ষা, পুলিশ এবং মহাকাশ গবেষণার মতো জরুরি পরিষেবাগুলো সচল থাকে।

২. **সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ("ভাষিণী" ফ্যাক্টর)**

- **মাতৃভাষায় ব্যবহার:** বিশ্বজুড়ে প্রচলিত এআই মডেলগুলো মূলত পশ্চিমা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ভারতের ২২টি সরকারি ভাষা এবং স্থানীয় উপভাষাগুলো বোঝার জন্য **'বচনা'** ও **'ভারত-জেন'**-এর মতো নিজস্ব মডেল প্রয়োজন।
- **প্রযুক্তির লোকতন্ত্রীকরণ:** এর ফলে গ্রামীণ ভারতের একজন কৃষক দেশের বাইরে তথ্য না পাঠিয়েই নিজের মাতৃভাষায় সরকারি পরামর্শ পেতে পারবেন।

৩. **ডেটা সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা**

- **তথ্য সুরক্ষা:** আধার, ইউপিআই (UPI) বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার মতো সংবেদনশীল জাতীয় তথ্য যেন বিদেশি সার্ভারে না যায় তা নিশ্চিত করা।
- **মেধা সম্পদ রক্ষা:** ভারতীয় স্টার্টআপগুলোর উদ্ভাবন যেন বিদেশি এআই মডেলের খোরাক হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, তা রক্ষা করা।

৪. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**

- **মূল্য ধরে রাখা:** ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি-তে এআই প্রায় **৫০০ বিলিয়ন ডলার** অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। সার্বভৌম এআই এই বিশাল অংকের অর্থ দেশের ভেতরেই রাখতে সাহায্য করবে।
- **খরচ নিয়ন্ত্রণ:** বিদেশি সংস্থাগুলোর চড়া দামের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কম খরচে কম্পিউটিং সুবিধা (যেমন- ইন্ডিয়া এআই মিশনের অধীনে সাশ্রয়ী জিপিইউ সুবিধা) প্রদান করা।

৫. **সর্বস্তরের সুশাসন**

- **ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন:** ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আধার, ইউপিআই) এর সাথে এআই-কে যুক্ত করে স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা।
- **স্থানীয় সমস্যার সমাধান:** বিদেশি মডেলগুলো সাধারণ কাজের জন্য তৈরি; কিন্তু ভারতের বর্ষার পূর্বাভাস বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ফসলের রোগ নির্ণয়ের জন্য আমাদের **"বিশেষায়িত মডেল"** প্রয়োজন।

৬. **নৈতিক এবং পক্ষপাতহীন এআই**

- **পাশ্চাত্য প্রভাব দূর করা:** আইনি বা সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাকেই "একমাত্র সঠিক" হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রোধ করা।
- **স্বচ্ছতা:** সার্বভৌম মডেল থাকলে সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারবে যে এআই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ধর্মের প্রতি বৈষম্য করছে কি না।

সার্বভৌম এআই বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"কম্পিউট" ঘাটতি:** ভারত বর্তমানে বিদেশি জিপিইউ-এর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতের নিজস্ব ক্ষমতা বাড়লেও বিশ্বসেরা টেক জায়ান্টদের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

২. **তথ্যের মান ও "টোকেন অসমতা":** ভারতের হাতে প্রচুর তথ্য থাকলেও তা সরকারি নথিপত্রে অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তথ্যের অভাব থাকায় সেই সব ভাষায় এআই ব্যবহার করা ব্যয়বহুল এবং কম নির্ভুল হয়ে পড়ে।

৩. **পাশ্চাত্য ভ্রান্ত ধারণা (Western Hallucinations):** বেশিরভাগ এআই মডেল পশ্চিমা তথ্যে শিক্ষিত হওয়ায় তারা ভারতের সামাজিক নিয়ম, জাতির বৈচিত্র্য বা স্থানীয় ঐতিহ্য বুঝতে ভুল করে, যা বিভ্রান্তিকর ফলাফল দিতে পারে।

৪. **মেধা পাচার (Brain Drain):** ভারতের প্রচুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও মূল এআই গবেষকের সংখ্যা অনেক কম। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমাদের সেরা মেধাবীরা বিদেশের (সিলিকন ভ্যালি) কোম্পানিতে চলে যাচ্ছেন।

৫. **আইনি ও নৈতিক জটিলতা:** ভারতে এখনও পূর্ণাঙ্গ "এআই আইন" নেই। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা স্পষ্ট না হওয়ায় (Black Box Problem) জনকল্যাণমূলক কাজে বৈষম্যের ঝুঁকি থেকে যায়।

৬. **আর্থিক ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা:** এআই মডেল তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদী এবং বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, যা ভারতে সীমিত। এছাড়া এআই ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর বিদ্যুৎ ও জল খরচ করে, যা ভারতের ২০৭০ সালের মধ্যে **"নেট জিরো"** বা দূষণমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সার্বভৌম এআই-এর জন্য সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. **ইন্ডিয়া এআই মিশন (IndiaAI Mission):** দেশীয় এআই ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য ১০,৩৭২ কোটি টাকার একটি "ফুল-স্ট্যাক" মিশন। এর অধীনে স্টার্টআপদের গবেষণার খরচ কমাতে অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে (প্রায় **৬৫ টাকা/ঘণ্টা**) জিপিইউ (GPU) ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

২. **ইন্ডিয়া এআই কম্পিউট পিলার (IndiaAI Compute Pillar):** ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ **১,০০,০০০ জিপিইউ** যুক্ত করে কম্পিউটিং ক্ষমতার ঘাটতি মেটানোর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, যা দেশীয় মডেলগুলোর জন্য উচ্চগতির প্রসেসিং ক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

৩. **ভারত-জেন (BharatGen) ও ভাষিণী (Bhashini):**
   - **ভারত-জেন:** ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি প্রথম সরকারি অর্থায়নে নির্মিত মাল্টিমোডাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)।
   - **ভাষিণী:** ২২টি তফসিলি ভাষায় রিয়েল-টাইম এআই অনুবাদের একটি মিশন, যা ডিজিটাল পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।

৪. **এআই-কোষ:** একে **"ডেটা-সাগর"** বলা হয়। এতে ৯,৫০০-এর বেশি দেশীয় ডেটাসেট রয়েছে, যা পশ্চিমা তথ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে উচ্চমানের প্রশিক্ষণের উপাদান (Data Fuel) সরবরাহ করে।

৫. **ইন্ডিয়া এআই ফিউচার স্কিলস:** ১৩,৫০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞ (PhD, PG, UG) তৈরির একটি লক্ষ্যমাত্রা। এর অধীনে ছোট শহরগুলোতে (Tier-2/3) ডেটা কিউরেশন এবং অ্যানোটেশনের জন্য **এআই ডেটা ল্যাব** স্থাপন করা হচ্ছে।

৬. **সার্বভৌম ক্ষমতা হাব:** ওড়িশা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক এআই-অপ্টিমাইজড ডেটা সেন্টার স্থাপন, যা খনি শিল্প, নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **মিতব্যয়ী উদ্ভাবন (Small Language Models - SLMs):** কৃষি বা আইনের মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ছোট এবং সাশ্রয়ী এআই মডেল (SLM) তৈরিতে জোর দেওয়া। এতে বিদ্যুৎ খরচ এবং কম্পিউটিং ক্ষমতা—উভয়ই কম লাগে।
- **সিলিকন-টু-সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন:** ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM)-এর সাথে এআই মিশনকে যুক্ত করা। নিজস্ব **এআই এক্সিলারেটর (ASICs)** ডিজাইন করলে ভারত কেবল সফটওয়্যার নয়, হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হবে।
- **'পেশেন্ট ক্যাপিটাল' বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ:** গভীর-প্রযুক্তি (Deep-tech) স্টার্টআপদের জন্য একটি **'এআই সার্বভৌম তহবিল'** গঠন করা। এতে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকবে।
- **গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব:** ভারতের এই "এআই স্ট্যাক" অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানি করা। একটি **"গ্লোবাল সাউথ এআই অ্যালায়েন্স"** গড়ে তোলার মাধ্যমে আমেরিকা-চীনের দ্বিমেরু প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানানো।
- **টেকসই এআই (Green Compute):** এআই ডেটা সেন্টারগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং **"সার্কুলার কুলিং"** প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে ভারতের ২০৭০ সালের **'নেট জিরো'** লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত না হয়।

উপসংহার

সার্বভৌম এআই কেবল একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়; এটি একটি **সভ্যতাগত প্রয়োজনীয়তা**। বিশ্ব যখন "পঞ্চম শিল্প বিপ্লব"-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত তার চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো বিদেশের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। নিজস্ব এআই স্ট্যাক তৈরির মাধ্যমে ভারত নিশ্চিত করছে যে তার ডিজিটাল ভবিষ্যৎ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নৈতিক এবং প্রকৃত অর্থেই **'আত্মনির্ভর'**।

*Q. "আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান প্রযুক্তিগত **সার্বভৌমত্ব** নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।" ভারতে একটি **সার্বভৌম এআই ইকোসিস্টেমের** প্রয়োজনীয়তা এবং এটি অর্জনের চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করুন।*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series